তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১১

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা: নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা[১]

তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য জানার অধিকার দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

[১] *জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন সাঈদ আহমেদ ও মো.হাবিবুর রহমান। গবেষণার কাঠামো নির্ধারণ ও উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন ড.অনন্য রায়হান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করেছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে জরিপ তত্ত্বাবধান ও বিশ্লেষণে ছিল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। প্রশ্নপত্র তৈরি, নাগরিক জরিপ তত্ত্বাবধান, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের কাজটি করেছে ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)/ডি.নেট।*

প্রারম্ভিক কথা

তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক গভীর। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সংসদে পাস হয় ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণীত হয়। সরকারি সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য।

তথ্য অধিকার ফোরাম একটি নেটওয়ার্ক—যার সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক সংগঠন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গও এর সঙ্গে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নে ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং উত্তর সময়ে আইনটি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজে যাচ্ছে। ফোরাম পুরো কাজটিকে একটি আন্দোলন হিসেবে দেখে।

এই আইনটি প্রণয়নের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর ফোরামের উদ্যোগে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অনলাইন এবং অফলাইন। এই দুই মাধ্যমে জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপটির মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণ এবং তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ। জরিপটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। একটি সীমাবদ্ধতা ছিল সময়ের সংক্ষিপ্ততা। জরিপটির ফলাফল কিছু নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা থেকে প্রাপ্ত, যা সমগ্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে নির্দেশ না করলেও কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার জন্য গুরুত্ব রাখে।

'তথ্য জানার অধিকার দিবস'-এর প্রাক্কালে এই জরিপটির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করছি 'Citizens' Independent Report on Implementation Status of RTI Act 2009' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশনার। সেখানে বিস্তারিতভাবে আরো অনেক প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণাত্মক বিষয় উঠে আসবে। পুরো কাজটিতে টিআইবি, আইআইডি/ডি.নেট, কোস্ট ট্রাস্ট, মানবসেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (খুলনা) এবং আরডিআরএস (রংপুর) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তাদের শ্রম ও আন্তরিকতাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করছি এই প্রবন্ধ হতে পাওয়া সুপারিশগুলো তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে

শাহীন আনাম
আহ্বায়ক, তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা : নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা

তথ্য জানার স্বাধীনতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ মানুষের মৌলিক অধিকারই শুধু নয়, এটি ব্যক্তির অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ দুর্নীতি প্রতিরোধ করে; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং সর্বোপরি, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

অবাধ তথ্য বিনিময় ও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার চারটি পূর্বশর্ত রয়েছে : ১. তথ্য সংরক্ষণ; ২. উৎসাহী তথ্যগ্রহীতা এবং তথ্যদাতা; ৩. তথ্য অধিকারের আইনি কাঠামো; এবং ৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রশাসনিক ও কাঠামোগত সামর্থ্য। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হবার পর বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের আইনি কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' সংসদে পাস হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে তা ৬ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আইনটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান' করা। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং অবাধ তথ্য বিনিময়ের অন্যান্য পূর্বশর্ত পর্যালোচনা করার জন্য আইনটি প্রণয়নের দুই বছর পূর্তিতে 'তথ্য অধিকার ফোরাম' একটি জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। সাধারণ নাগরিক এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্যগ্রহীতা এবং তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করা।

> "জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য গ্রহীতা এবং তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করা"

উল্লেখ্য, সীমিত পরিসরের এই জরিপের নমুনায়ন প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে করা হয়নি, ফলে এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং জরিপকৃত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাকে নির্দেশ করে মাত্র।

তবে জরিপের ফলাফল নাগরিক অভিজ্ঞতার এমন কিছু আগ্রহোদ্দীপক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে, যা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মনোভাব পরিবর্তন, প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি

নাগরিক জরিপে শহর ও পল্লীর মোট ১,০১৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে ৩১.৫ শতাংশ নারী এবং ৬৮.৫ শতাংশ পুরুষ উত্তরদাতা রয়েছেন। রংপুর, কক্সবাজার, ভোলা, খুলনা ও যশোর জেলা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পারপাসিভ পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নির্বাচনের মাধ্যমে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। উত্তরদাতাদের ৩১.৫ শতাংশ নারী এবং ৬৮.৫ শতাংশ পুরুষ। উত্তরদাতাদের প্রায় ৮০ শতাংশের বয়সই ২৫ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে।

প্রাতিষ্ঠানিক জরিপে ভৌগোলিক বিস্তৃতি বিবেচনায় রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৬টি এলাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক ২১৬টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়; এর মধ্যে ১০৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ১০৮টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)। উত্তরদাতারা ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে ভালো জানেন এমন কর্মকর্তা। তথ্যদাতাদের ৯০.৭ শতাংশ ছিলেন পুরুষ এবং ৯.৩ শতাংশ নারী, যাদের গড় বয়স ছিল ৪৬.৮ বছর। তথ্যদাতারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৭ বছর ধরে কর্মরত আছেন—এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যদাতারা গড়ে ৩.৫ বছর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা গড়ে ১০.৭ বছর কর্মরত আছেন। তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০১১ সালের মে মাসে।

১. নাগরিক প্রেক্ষিত

১.১ তথ্য জানার অজানা অধিকার

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জানেন না বলে জানিয়েছেন। তবে যে ৫৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতা আইনটি সম্পর্কে জানেন, তাদের অধিকাংশই (৫৯.২ শতাংশ) ১ জুলাই ২০০৯-এর পর প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। যে ৪০.৮ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হননি, তাদের তিন-চতুর্থাংশই (৭৫.৯ শতাংশ) কোনো তথ্যের দরকার হয়নি বলে জানিয়েছেন। অন্যদের মধ্যে ১৬.৪ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে তথ্য পেয়েছেন এবং বাকি ৭.৮ শতাংশ তথ্য চেয়েও পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থেকেছেন বলে জানিয়েছেন। যারা তথ্য চেয়েছেন, তাদের মধ্যেও তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারের প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়। তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের মাত্র ১২.৫ শতাংশ আইনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট আবেদনপত্র ব্যবহার করে তথ্য চেয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের অসচেতনতার বিষয়টিই তথ্য প্রবাহের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে এই জরিপে উঠে এসেছে। অনেক নাগরিক নির্দিষ্ট আবেদনপত্র ব্যবহারের পরিবর্তে সনাতন ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে তথ্য পেতেও বেশি অভ্যস্ত।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করার একাধিক উত্তর নির্ধারণের সুযোগ সংবলিত প্রশ্নে ৮৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতা আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ৮৪.১

শতাংশ উত্তরদাতা যথেষ্ট প্রচারের অভাবকেই দায়ী করেছেন। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিত নিয়ে যে জরিপটি হয়েছে, সেখানেও এই কারণ দুটিকেই মূলত দায়ী করা হয়।

১.২ তথ্য সরবরাহ

উৎসাহের বিষয় হলো, যারা কোনো না কোনো মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই আবেদনকৃত তথ্য পেয়েছেন এবং যারা তথ্য পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশই (৭৩.৬ শতাংশ) সম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। অন্যদিকে ২৬.৪ শতাংশ আবেদনকারী পেয়েছেন আংশিক তথ্য। আংশিক তথ্য পাওয়ার কারণ হিসেবে ৫৭.৫ শতাংশ আবেদনকারীকে বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই; আর ১৫ শতাংশ আবেদনকারীকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের কাছে আবেদনপত্রটি পাঠানো হলেও তারা তথ্য সরবরাহ করেনি। বাকি ২৭.৫ শতাংশ আবেদনকারীকে জানানো হয়েছে যে আংশিক তথ্যটি 'অব্যাহতির আওতাভুক্ত' বিধায় প্রতিষ্ঠান তা দিতে বাধ্য নয়।

"যারা কোনো না কোনো মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই আবেদনকৃত তথ্য পেয়েছেন এবং যারা তথ্য পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশই (৭৩.৬ শতাংশ) সম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছেন"

তথ্য পাওয়ার কারণ জানতে একাধিক উত্তর নির্ধারণী প্রশ্নের জবাবে মাত্র ৬.৩ শতাংশ উত্তরদাতা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেই তথ্যটি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ৮৮.২ শতাংশই মনে করেন যে তারা সাধারণভাবে যোগাযোগ করেই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অন্যদের মধ্যে ৫.৪ শতাংশ তথ্য-সংগ্রহকারী 'প্রভাব খাটিয়ে' এবং প্রায় ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা তথ্য-প্রদানকারীর সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে তথ্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ আছে। যেসব আবেদনকারী তথ্য পেয়েছেন, তাদের মধ্যে ৮৭.৮ শতাংশই অনধিক ২০ দিনের মধ্যেই অনুরোধকৃত তথ্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন (তন্মধ্যে ৬৪.১ শতাংশই তথ্য পেয়েছেন অনধিক ১০ দিনের মধ্যে)। বাকিদের মধ্যে ১০.১ শতাংশ আবেদনকারী অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে এবং ২.১ শতাংশ আবেদনকারী আইনে উল্লিখিত সময়সীমার পর (৩১ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে) তথ্য পেয়েছেন।

"আংশিক তথ্য পাবার কারণ হিসেবে ৫৭.৫ শতাংশ আবেদনকারীকে বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই"

চিত্র ১ : আবেদন করার কত দিনের মধ্যে তথ্য পেয়েছেন?

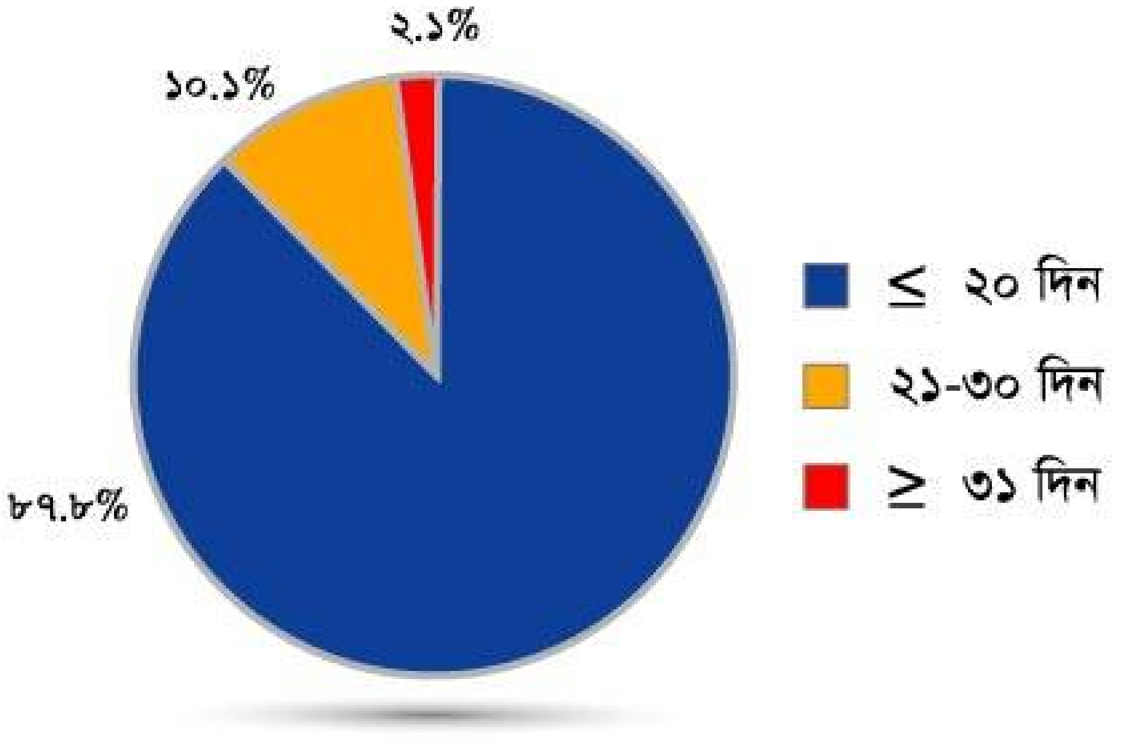

আবেদনকারীদের ৯০.৮ শতাংশকেই তথ্য পাওয়ার জন্য কোনোরূপ মূল্য পরিশোধ করতে হয়নি। বাকি ৯.২ শতাংশকে বিভিন্ন হারে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। তন্মধ্যে, ৪৫.২ শতাংশ আবেদনকারী ব্যয় করেছেন অনধিক ১০০ টাকা এবং ৩৮.৭ শতাংশকে ১০১ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে ব্যয় করতে হয়েছে। বাকি ১৬.১ শতাংশকে ৫০০ টাকার বেশি ব্যয় করতে হয়েছে।

১.৩ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

ধারণা করা হয়ে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাগরিকগণ যেসব তথ্যের জন্য আবেদন করে থাকেন, তার সবই 'তথ্য অধিকার' সংক্রান্ত নাও হতে পারে। তবে জরিপের ফলাফল অনুসারে তথ্যের আবেদনকারীদের মধ্যে ৫৭.১ শতাংশই নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে তথ্য চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। একাধিক উত্তর নির্ধারণী এ প্রশ্নে ৫২.৮ শতাংশ জানিয়েছেন যে তারা অন্য কোনো নাগরিককে সহায়তা করার জন্য তথ্যের আবেদন করেছেন। এছাড়াও ২১ শতাংশ আবেদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং ২৪.৭ শতাংশ আবেদনকারী অন্যান্য কারণে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন।

তবে যারা তথ্য পাননি, তাদের প্রায় সবাই (৯৭.১ শতাংশ) বিকল্প উপায়ে তথ্যের অভাবে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করেছেন। তন্মধ্যে ৮১ শতাংশই ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে, ১৯ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব খাটিয়ে এবং ৯.৫ শতাংশ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মূলত যৌক্তিক কারণেই নাগরিকগণ তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন এবং তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে বিকল্প উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

১.৪ তথ্য প্রাপ্তির বিড়ম্বনা

যারা তথ্য পেয়েছেন, তাদের ৭০.৬ শতাংশের মতে তথ্য প্রাপ্তিতে কোনো প্রকার হয়রানির শিকার হতে হয়নি। তবে ২৯.৪ শতাংশকে তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনোভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। যারা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৮৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে

> যারা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৮৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে বারবার যেতে হয়েছে, ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে তদবির করতে হয়েছে, ৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে, এবং ২৫.৬ শতাংশ ক্ষেত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হয়েছে।

বারবার যেতে হয়েছে, ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে তদবির করতে হয়েছে, ৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে এবং ২৫.৬ শতাংশ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হয়েছে। হয়রানির শিকার আবেদনকারীদের ২২.২ শতাংশ তথ্য সংগ্রহে গিয়ে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন।

যারা আবেদন করেও তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের ৭৯.৪ শতাংশই মনে করেন যে তারা তথ্য না পাওয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং মাত্র ২০.৬ শতাংশ আবেদনকারী তথ্য না পাওয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হননি বলে জানিয়েছেন। যারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তারা অধিকাংশই একাধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন, ৪৫ শতাংশ তথ্যের অভাবে দুর্নামের ভাগীদার হয়েছেন এবং ৮৫ শতাংশই অধিকার বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে করেন।

১.৫ সরকারি ও বেসরকারি তুলনামূলক অবস্থান

যারা তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন, তাদের মধ্যে ৮৬.৪ শতাংশই কোনো না কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চেয়েছেন মাত্র ১৩.৬ শতাংশ।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করে যেখানে ১০.৩ শতাংশ আবেদনকারী তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন ৮.৭ শতাংশ আবেদনকারী। একইভাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের মধ্যে ২৬.১ শতাংশ আংশিক তথ্য পেয়েছেন; পক্ষান্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করে আংশিক তথ্য পেয়েছেন ২৮.৬ শতাংশ।

তবে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানেই তথ্য অধিকার আইন ও ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের প্রভাব প্রায় সমান হলেও, প্রভাব খাটিয়ে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান কিছুটা এগিয়ে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে ৪.১ শতাংশ ও ১.৫ শতাংশ আবেদনকারী প্রভাব খাটিয়ে তথ্য পেয়েছেন, আর এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে যোগাযোগ করে তথ্য পেয়েছেন যথাক্রমে ৬০.৬ শতাংশ ও ৬২.১ শতাংশ আবেদনকারী।

> তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

চিত্র ২ : কী কারণে তথ্যটি পেয়েছেন বলে মনে করেন?

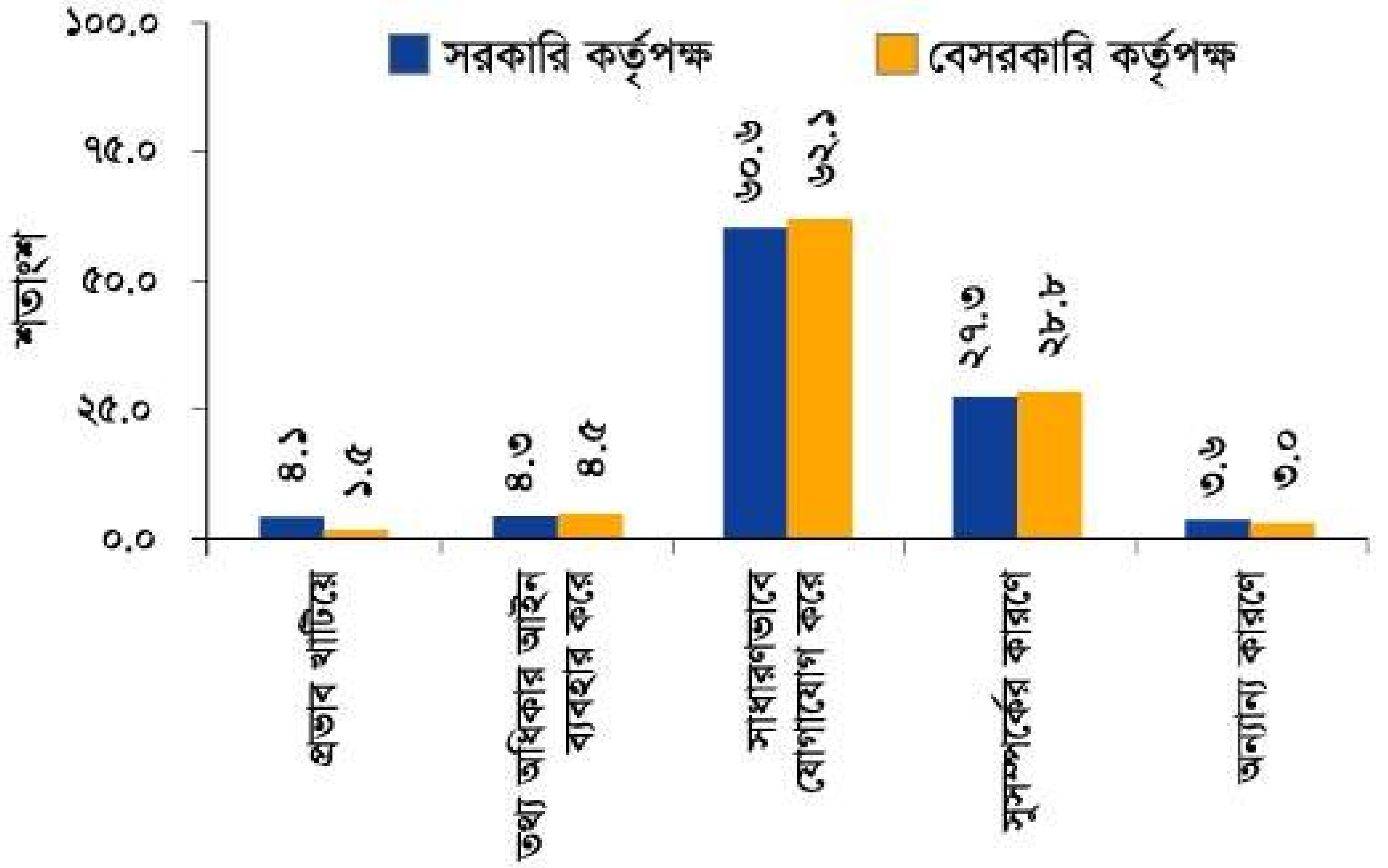

তথ্য প্রদানের সময়সীমার ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। তথ্য প্রদানের ৮৫.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান ২০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে, পক্ষান্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৮৮.৬ ভাগ আবেদনকারীকে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছে।

চিত্র ৩ : আবেদন করার কত দিনের মধ্যে তথ্য পেয়েছেন?

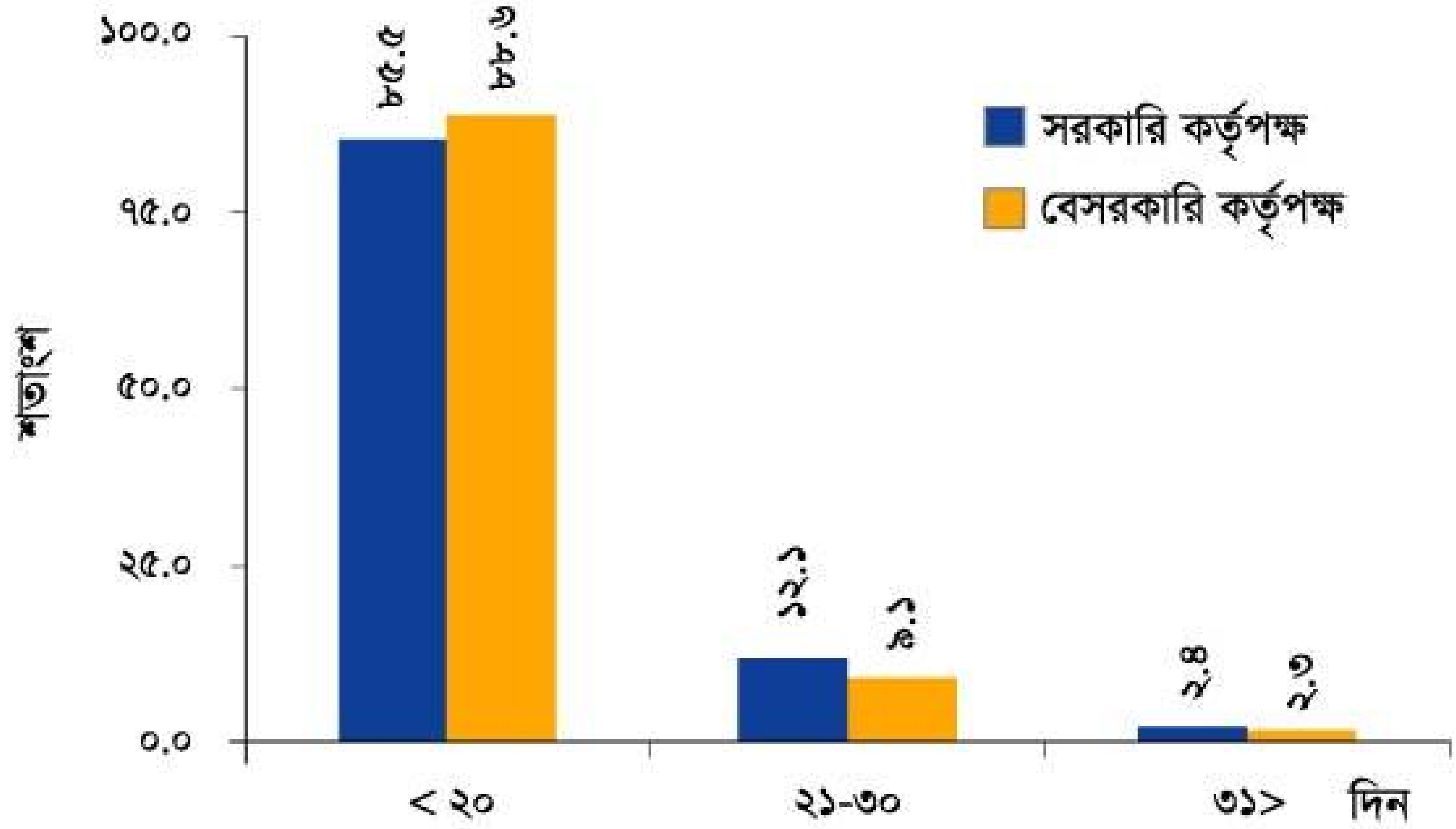

আপাত দৃষ্টিতে ২০ দিনের বাধ্যবাধকতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিছুটা ভালো অবস্থানে থাকলেও, ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতায় উভয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সমান। সম্ভবত সরকারি প্রতিষ্ঠানে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা বেশি থাকার কারণে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতা অনুসরণের প্রচলন একটু বেশি পরিলক্ষিত হয়।

১.৬ নারী-পুরুষের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অভিজ্ঞতায় খুব কম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নারী তথ্য আবেদনকারীদের ৮৯.৭ শতাংশ ২০ দিনের মধ্যে এবং ৬.৯ শতাংশ ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য পেয়েছেন। সময়ের বাধ্যবাধকতার মধ্যে তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন ৩.৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে, পুরুষ তথ্য আবেদনকারীদের ৮৪.৯ শতাংশ ২০ দিনের মধ্যে এবং ১২.৯ শতাংশ ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য পেয়েছেন। সময়ের বাধ্যবাধকতার মধ্যে তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন ২.২ শতাংশ পুরুষ।

চিত্র ৪ : তথ্য সংগ্রহে কী ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন?

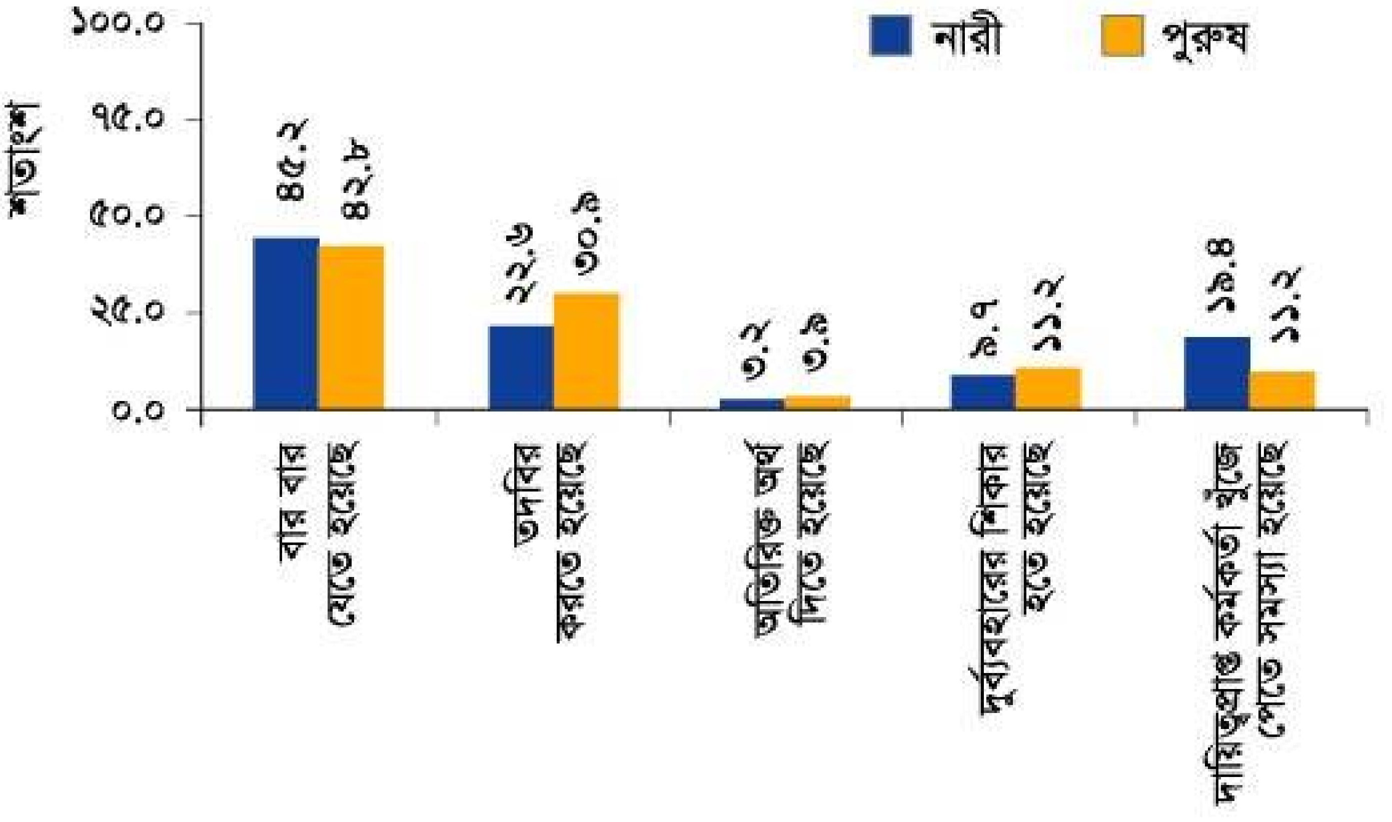

তথ্য সংগ্রহে হয়রানির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অভিজ্ঞতায় কিছুটা ভিন্ন রয়েছে। হয়রানির শিকার নারী তথ্য আবেদনকারীদের ৪৫.২ শতাংশকে বারবার যেতে হয়েছে এবং ১৯.৪ শতাংশের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হয়েছ। পক্ষান্তরে পুরুষ তথ্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৪২.৮ শতাংশ ও ১১.২ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষ তথ্য আবেদনকারীদের মধ্যে ৩০.৯ শতাংশকে তদবির করতে হয়েছে এবং ১১.২ শতাংশকে দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছে। নারী তথ্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এই হার কিছুটা কম—যথাক্রমে ২২.৬ শতাংশ ও ৯.৭ শতাংশ।

২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিত

২.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্যদাতারা বলেছেন যে তথ্য অধিকার আইন পাস করার পরে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫৩.৭ শতাংশ সরকারি ও ৬৩.৯ শতাংশ বেসরকারি এবং সার্বিকভাবে ৫৮.৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন।

চিত্র ৫ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে

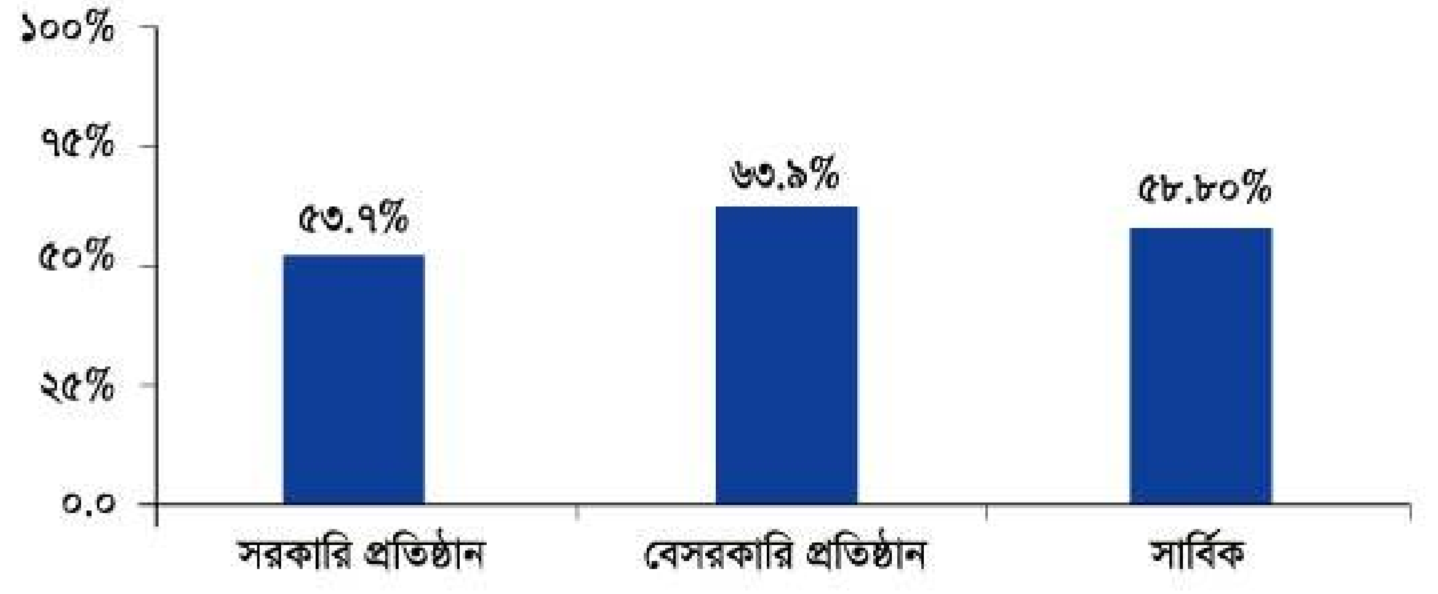

যেসব প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি তারা বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করেছেন-যার মধ্যে ৭.৯ শতাংশ বলেছেন প্রতিষ্ঠানে যে কর্তৃপক্ষ তা তাদের জানা ছিল না, ১৮.০ শতাংশ বলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি জানা ছিল না, ৭.৯ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নিয়োগ করা হয়নি, প্রয়োজনবোধ করেননি বলেছেন ১৮.০ শতাংশ, জনসংযোগ কর্মকর্তা ইতোমধ্যে বিদ্যমান আছেন বলেছেন ১৫.৭ শতাংশ এবং ৩৮.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার এখতিয়ার ও নির্দেশনা নেইসহ অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন।

যেসব প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি তার মধ্যে সার্বিকভাবে ৫১.৭ শতাংশ বলেছেন তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কথা ভাবছেন যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৫৮.০ শতাংশ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৪৮.৭ শতাংশ। যেসব প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৯০.৬ শতাংশ বলেছেন তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন—যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ২৯.৬ শতাংশ বলেছেন উক্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছে, আইন পড়তে বলা হয়েছে ২৪.৩ শতাংশ, প্রকাশিত ম্যানুয়েল বা হ্যান্ডবুক সংগ্রহ করে পড়তে বলা হয়েছে ৪৪.৩ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে ২৩.৫ শতাংশ এবং ১৬.৫ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য উদ্যোগের কথা, যার মধ্যে রয়েছে পত্রপত্রিকা পড়তে বলা, মৌখিকভাবে আইনটি, বোঝানো এবং প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি।

> “যে সব প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি তাদের মধ্যে ১৮.০ শতাংশ বলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি জানা ছিল না, ৭.৯ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নিয়োগ করা হয়নি, প্রয়োজনবোধ করেননি বলেছেন ১৮.০ শতাংশ”

২.২ নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি

তথ্যদাতাদের ৮৩.৮ শতাংশ বলেছেন তথ্য অধিকার আইন পাসের পরে তাদের প্রতিষ্ঠানে নাগরিকরা তথ্য চেয়েছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চেয়েছিল বলেছেন ৮৪.৩ শতাংশ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে চেয়েছিল বলেছেন ৮৩.৩ শতাংশ। যদিও তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে লিখিত আবেদন করে চেয়েছিল নাকি অন্য কোনোভাবে চেয়েছিল তা জানা যায়নি। তথ্যদাতাদের ৬২.৮ শতাংশ বলেছেন চাহিদাকৃত তথ্যের বিষয় ছিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, ৪০ শতাংশ বলেছেন সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত, ২৮.৯ শতাংশ বলেছেন আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত এবং ৩৬.৭ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত—যার মধ্যে ছিল নিয়োগ, টেন্ডার ও সেবা প্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি। নাগরিকরা তথ্য চেয়েছিল কিন্তু দিতে পারেননি বলেছেন ৯.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান যেখানে সরকারি ৯ শতাংশ ও বেসরকারি ১০ শতাংশ। যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে পারেনি তার মধ্যে ৪৭.১ শতাংশ বলেছেন তথ্যটি খুঁজে পাওয়া যায়নি, তথ্যটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত ২৯.৪ শতাংশ এবং ২৩.৫ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য কারণের কথা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তথ্যটি ছিল না ও তথ্যটি প্রক্রিয়াধীন ছিল।

“ যে সব প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে পারেনি তার মধ্যে ৪৭.১ শতাংশ বলেছেন তথ্যটি খুঁজে পাওয়া যায়নি, তথ্যটি অব্যাহতি প্রাপ্ত ২৯.৪ শতাংশ এবং ২৩.৫ শতাংশ বলেছেন অন্যান্য কারণের কথা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তথ্যটি ছিল না ও তথ্যটি প্রক্রিয়াধীন ছিল ”

২.৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৬-এর ১ ও ২ উপধারায় বলা হয়েছে যে, ‘প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সব তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।’ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্নভাবে তথ্য প্রকাশ করে থাকে বলে মত দিয়েছেন। যার মধ্যে ওয়েবসাইট (২৮.৭%), বার্ষিক প্রতিবেদন (৫৭.৪%), লিফলেট (৪১.৬%), নোটিশ বোর্ড (৭৩.৩%), বিজ্ঞাপন (২০.৮%), প্রকাশনা (৩১.৭%), সভা/সমাবেশ (৩৮.৬%) ও অন্যান্য (১২.৯%) ইত্যাদি।

২.৪. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে তথ্যদাতারা একাধিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ তথ্যদাতাই (৭৫.৩%) বলেছেন যথেষ্ট প্রচারের অভাবের কথা। এরপর যথাক্রমে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা (৭৩.৫%), তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব (৪৪.৭%), গোপনীয়তার মানসিকতা (৩৮.১%), নাগরিকদের তথ্য চাওয়ার চাহিদা নেই (৩৩.৫%), প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির অভাব (৩০.৭%), বেসরকারি সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা (২২.৮%), কারিগরি প্রস্তুতির অভাব (২০.৫%), মিডিয়ার অনাগ্রহ (১৬.৩%), আইনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আক্ষেপ (১৩%) ও অন্যান্য (১৩.৫%)।

সারণি ১ : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল চ্যালেঞ্জ

মূল চ্যালেঞ্জ	সরকারি	বেসরকারি	সার্বিক
আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা	৭২.৯%	৭৪.১%	৭৩.৫%
তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব	২৬.২%	৬৩%	৪৪.৭%
তথ্য চাওয়ার চাহিদা নেই	৩১.৮%	৩৫.২%	৩৩.৫%
যথেষ্ট প্রচারের অভাব	৭৭.৬%	৭৩.১%	৭৫.৩%
বেসরকারি সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা	১৭.৮%	২৭.৮%	২২.৮%
প্রতিষ্ঠানের আইনের ভুল ব্যাখ্যা	৫.৬%	৯.৩%	৭.৯%
প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির অভাব	২৬.২%	৩৫.২%	৩০.৭%
কারিগরি প্রস্তুতির অভাব	২২.৪%	১৮.৫%	২০.৫%
গোপনীয়তার মানসিকতা	২৭.১%	৪৯.১%	৩৮.১%
আইনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আক্ষেপ	১০.৩%	১৫.৭%	১৩%
মিডিয়ার অনাগ্রহ	১১.২%	২১.৩%	১৬.৩%
অন্যান্য	১৫%	১২%	১৩.৫%

(একজন উত্তরদাতা একাধিক মতামত দিয়েছেন)

২.৫ তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘনের শাস্তি যথেষ্ট কিনা

তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘনের শাস্তি যথেষ্ট মনে করেন ৫০.৫ শতাংশ তথ্যদাতা, যথেষ্ট মনে করেন না ৩৪.৭ শতাংশ এবং এই বিষয়ে জানেন না বলেছেন ১৪.৮ শতাংশ তথ্যদাতা। যারা মনে করেন আইন লঙ্ঘনের শাস্তি যথেষ্ট নয়, কারণ হিসাবে তাদের মধ্যে ৮২.৭ শতাংশ মনে করেন জরিমানার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, ২৮.০ শতাংশ মনে করেন জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি দীর্ঘ এবং ১০.৭ শতাংশ অন্যান্য কারণের কথা বললেও তা উল্লেখ করেননি।

২.৬ তথ্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা

১৯ শতাংশ তথ্যদাতা তথ্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করলেও ৬৬.২ শতাংশ তথ্যদাতা মনে করেন যথেষ্ট শক্তিশালী নয় এবং ১৪.৮ শতাংশ এই বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করেননি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যদাতাদের ২৫ শতাংশ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৩ শতাংশ মনে করেন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী। যারা মনে করেন তথ্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তারা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। ৩৫ শতাংশ বলেছেন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নেই ও ১৯.৬ শতাংশ বলেছেন তথ্য কমিশনারদের পদমর্যাদা যথেষ্ট নয়। ৩০.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা নেই এবং কমিশন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা জানেন না। এছাড়াও ৫১.৭ শতাংশ বলেছেন তথ্য কমিশন আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে কী উদ্যোগ নিয়েছেন তা জানেন না, কমিশন থেকে সকল পর্যায়ের অফিসকে জানানোর কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা জানেন না, কমিশনের পক্ষ থেকে

ব্যাপক প্রচার করার আরো সুযোগ রয়েছে ও সরকারের সদিচ্ছার অভাবসহ অন্যান্য কারণ। এখানে উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সর্বক্ষণিক সদস্যদের পদমর্যাদা হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের সমমানের হলেও তথ্য কমিশনের কমিশনারদের পদমর্যাদা সচিবের সমপর্যায়ে। তাই তথ্য কমিশনের কমিশনারের পদমর্যাদা পুণর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

চিত্র ৬ : তথ্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা

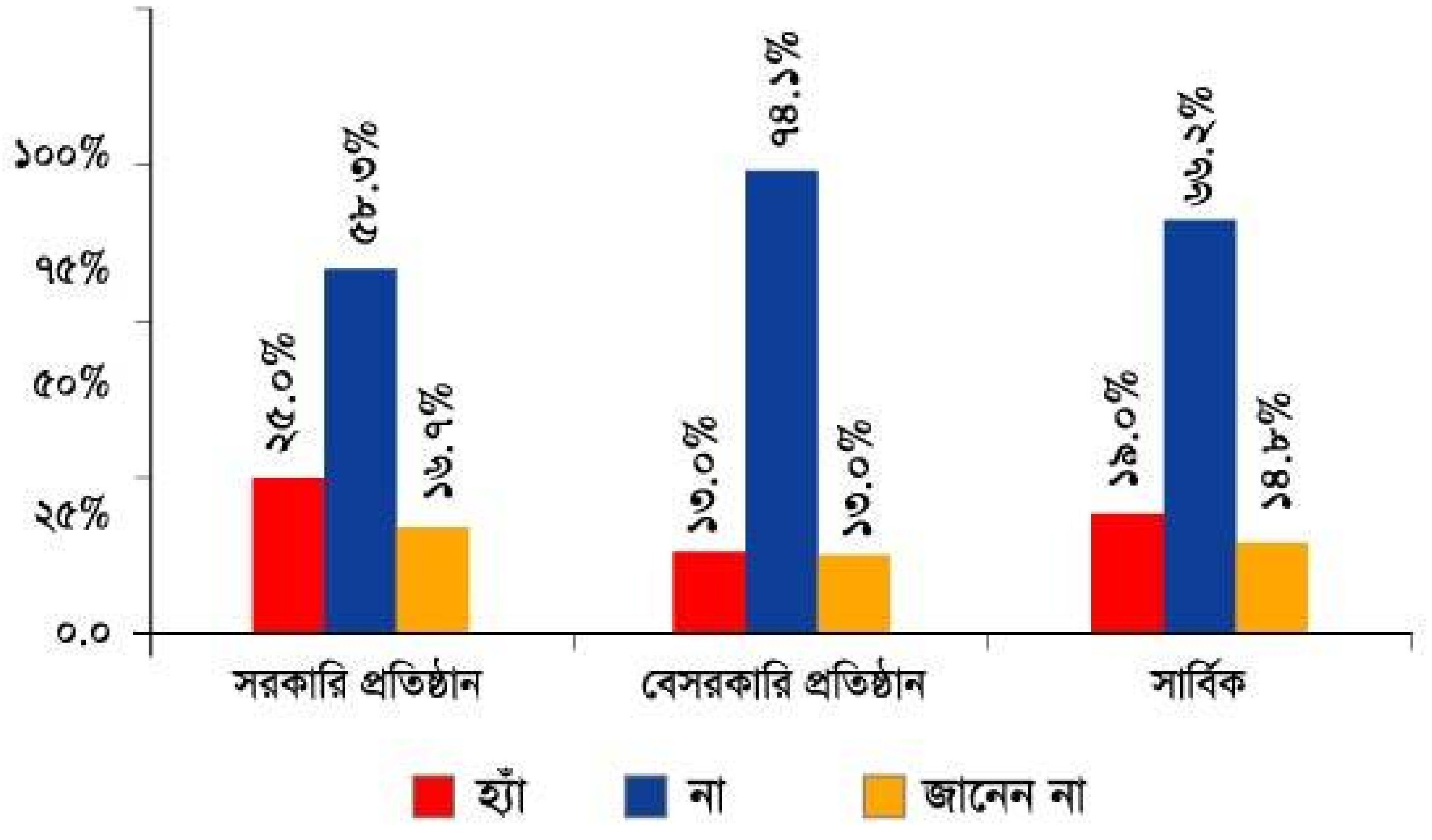

৩. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে করণীয়

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' থাকা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও, তা যথেষ্ট নয়। আইনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য বেশ কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহারে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতায় সামগ্রিকভাবে যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হলো আইনটির প্রচার ও বাস্তবায়ন কাঠামোর সীমাবদ্ধতা। তথ্য আদান-প্রদানে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার আলোকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পাঁচটি মূল করণীয় চিহ্নিত করা যায় :

৩.১ তথ্য প্রস্তুত

তথ্য আদান-প্রদানের প্রথম শর্তই হচ্ছে তথ্য প্রস্তুত থাকা। তদুপরি, নাগরিকদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণ তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের ৫৭.৫ শতাংশ আবেদনকারীই অসম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকাকে দায়ী করেছেন। অথচ তথ্য অধিকার আইনের ৫(১) ধারায় বলা হয়েছে—'এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত

করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে' আইনের এই শর্তটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (বিশেষত সরকারি) প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থাভাব বা এই খাতে ভিন্ন বাজেট না থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে। কিন্তু প্রশাসনের বর্তমান কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমেও এই তথ্য-ঘাটতি দূর করা সম্ভব। যেমন—ইতোমধ্যেই গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট ও তথ্যভাণ্ডার তৈরির যে কাজ চলছে তাকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তথ্য কমিশনের অভিযোগ বিশ্লেষণ করে যে ধরনের তথ্য নাগরিকদের বেশি প্রয়োজন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে এই সকল ওয়েবসাইট ও তথ্যভাণ্ডারে যুক্ত করা যেতে পারে। যে ধরনের তথ্য সহজলভ্য নয়, তাদের একটি তালিকা তৈরি করে, তার মধ্য থেকে কোনগুলো চলমান সরকারি বাৎসরিক জরিপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়, তা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা থেকেও অনেক সময় তথ্য সংরক্ষণে ঘাটতি দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সংরক্ষণে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৩.২ তথ্য আদান-প্রদানের অবকাঠামো

জরিপে দেখা গিয়েছে, আবেদনকারীদের ৮৮.৭ শতাংশকেই তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর যারা তথ্য পেতে হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের তাদের মধ্যে ৮৭.৮ শতাংশকে তথ্য পেতে বারবার যেতে হয়েছে। যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র ২.৬ শতাংশ আবেদনকারী ডাক ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যা বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থার বর্তমান চিত্রকেই তুলে ধরে। অন্য দিকে তথ্য সংগ্রহে বারবার যাওয়ার বিষয়টি এড়ানোর জন্য বহুল প্রচলিত মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আবেদনকৃত তথ্য প্রস্তুত করার পর আবেদনকারীকে মুঠোফোনবার্তার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের দিন জানিয়ে দিতে পারে।

৩.৩ গণসচেতনতা ও তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক অভিজ্ঞতায় যে বিষয়টি সর্বাগ্রে উঠে এসেছে, তা হলো তথ্য আদান-প্রদানকারীদের সচেতনতার অভাব। নাগরিক জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশই তথ্য

> ### ভবিষ্যত করণীয়
>
> ১. তথ্য ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ
>
> ২. তথ্য আদান-প্রদানে ডাক ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
>
> ৩. আইনটি সম্পর্কে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
>
> ৪. নাগরিকের কাছে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি
>
> ৫. তথ্য কমিশন ও বিদ্যমান আইন প্রয়াগকারী সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি ও পদমর্যাদা সুনির্দিষ্টকরণ
>
> ৬. তথ্য সংগ্রহের একাধিক বিকল্প নিশ্চিতকরণ

অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জানেন না বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইন পাসের দুই বছর পর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাত্র ৫৩.৭ শতাংশ সরকারি ও ৬৩.৯ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। যারা কর্মকর্তা নিয়োগ দেননি, তাদের মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অজ্ঞতা লক্ষ করা যায়। আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'তথ্য অধিকার দিবস' পালনের পাশাপাশি নিয়মিতই গণমাধ্যম ব্যবহার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

কেবল তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাই নাগরিকের কাছে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে না। এজন্য দৈনন্দিন জীবনে তথ্য কীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে তা সহজভাবে সাধারণ নাগরিকের কাছে তুলে ধরতে হবে।

৩.৪ আইনের প্রয়োগ কাঠামো

নাগরিকদের মধ্যে যারা সম্পূর্ণ তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের ১৫ শতাংশ আবেদনকারীকে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের কাছে আবেদনপত্রটি পাঠানো হলেও তারা তথ্য সরবরাহ করেনি। তথ্য আইনে তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতাটি সুস্পষ্ট নয় বলে মনে হয়েছেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৬৬.২ শতাংশ তথ্যদাতাই মনে করেন যে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে স্থাপিত তথ্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তবে তথ্য আইন প্রয়োগে সম্প্রতি দু'জন কর্মকর্তার বিষয়ে তথ্য কমিশন যে ধরনের সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। উল্লেখ্য, আমাদের জরিপটি এ ঘটনার পূর্বে পরিচালিত হওয়ায় এখানে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়নি। যে সকল কর্তৃপক্ষের এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি সেই সকল কর্তৃপক্ষের বিষয়ে তথ্য কমিশনের আইন অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সমমানের অন্যান্য কমিশনের কমিশনারদের পদমর্যাদার সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য কমিশনের কমিশনারদের পদমর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন।

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের বিকল্প পথ

তথ্য সংগ্রহে আবেদন এবং তার প্রক্রিয়াকরণ তথ্য গ্রহীতা ও তথ্যদাতা উভয়ের জন্যই অর্থ, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বিষয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য প্রদানের বিকল্প পথ ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের তথ্য নিয়মিত চাওয়া হয় সেগুলোকে ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের কাজ অনেকাংশেই লাঘব করা যায়।

তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন নাগরিকদের অনেকেই তথ্য কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান তথ্য কর্মকর্তার অবর্তমানে বিকল্প হিসেবে ভারপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বসার স্থান যেন জনগণের জন্য প্রবেশযোগ্য হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য যেকোনো বিনিময়ের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইন তথ্য যোগানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে, কিন্তু তথ্যের চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য সকলের

অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইনের প্রবর্তন শুধু তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদেরকেই দায়িত্বশীল করে না, বরং তা আইন বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে দেশের সচেতন নাগরিক, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন কর্মীদের দায়িত্বও বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

---

* ড. *অনন্য রায়হান*, 'ডি.নেট' এর নির্বাহী পরিচালক; *সাঈদ আহমেদ* 'ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)/ডিনেট' এর সিইও এবং *মো. হাবিবুর রহমান* 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি)' এর ফেলো।

নাগরিক পর্যায়ে জরিপ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ড. সোহেল ইকবাল (কোস্ট ট্রাস্ট); মো.শফিকুল ইসলাম (মানব সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, খুলনা); এনামুল কবির (আরডিআরএস, রংপুর); এবং মাসুম বিল্লাহ ও ঝলক রঞ্জণ তালুকদার (আইআইডি)।

এই কার্যপত্রে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। সেমিনারের মতবিনিময়ের পর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হবে।

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে
জরিপ তত্ত্বাবধান ও বিশ্লেষণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ (টিআইবি)

প্রশ্নপত্র তৈরি, নাগরিক জরিপ তত্ত্বাবধান,
বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন

ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স
এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)/ডিনেট